ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১৪৩-১৬২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4111

আইয়ুব আমলে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব: ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতিক্রিয়া

ড. এ. এস. এম. মোহসীন
সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), ডিপার্টমেন্ট অব বেসিক সায়েন্সেস এণ্ড হিউম্যানিটিজ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

Abstract: Pakistan was created in 1947 in an artificial and communal manner. The leadership of Pakistan were worried about their nation's vulnerability. It was the same under Ayub Khan's reign of martial law. Ayub Khan committed a number of actions that were detrimental to the Bangla language and culture, such as changing the spelling and language of the Bangla language, writing it in Roman characters, and criticising Rabindranath Tagore's writings. The majority of Dhaka's newspapers supported the anti-Ayub campaign. This essay aims to evaluate the function of Dhaka's daily newspapers in light of many campaigns against Bangla language and culture in the Ayub period. The present article has taken into account various daily newspapers, including the *Azad*, *Ittefaq*, *Sangbad*, *Poygum*, *Pakistan Observer*, *Doinik Pakistan*, and *Morning News*.

Key Words: Ayub Era, Bangla Language, Reformation.

হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন দুই ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে ধর্ম ছাড়া বস্তুত আর কোন ঐক্যসূত্র ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই নাজুক বাস্তবতা সম্পর্কে দেশটির শাসকরা আগা গোড়াই সচেতন ছিলেন। তারা জানতেন ভাষা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যই পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যবোধের এক বড় উৎস যেটি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এটিকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে যেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য পাকিস্তানের জন্ম থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল এই স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ করা। আইয়ুব খানের শাসনামল এর ব্যতিক্রম ছিল না। ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক যে আন্দোলন মধ্য পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছিল তা ষাটের দশকে এসে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক ও স্বৈর শাসনে আরও তীব্র মাত্রা অর্জন করে। আইয়ুব খান বিভিন্নভাবে বাঙালি চেতনা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, খাজা নাজিমউদ্দীন প্রমুখের মত আইয়ুব খান নিজেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে বিভিন্ন নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল - রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তনের প্রয়াস, রবীন্দ্র বিরোধিতা, বাংলা বানান,

বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরুর পর বিশেষত ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলনের পূর্বে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য বা বিবৃতি উচ্চারিত না হলেও পরোক্ষভাবে ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও কিছু রাজনীতিবিদ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

১. যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস

আইয়ুব আমলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননাকে ঘিরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়ন, পত্রিকাসমূহে জনমতের প্রতিফলন ও জনমত গঠনে এদের ভূমিকা নির্ধারণ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণ, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণের নিজস্ব অভিমত, যুক্তিতর্ক নিরীক্ষা করে আইয়ুব আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ সাধনে তৎকালীন পূর্ব বাংলার গণমাধ্যমের অন্যতম অংশ হিসেবে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের অবস্থান স্পষ্ট করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি, যেখানে আলোচ্য দৈনিক পত্রিকাসমূহ এবং অন্যান্য সরকারি দলিল-দস্তাবেজ প্রাথমিক এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, গবেষণা প্রবন্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ধারাবাহিক এবং সময়ানুক্রমিকভাবে করা হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার তৎকালীন মুদ্রিত গণমাধ্যম বিশেষত দৈনিক পত্রিকাসমূহের ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পাদিত গবেষণার শূন্যতা রয়েছে। আইয়ুব আমলের উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকা ছিল - *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *পয়গাম*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *মর্নিং নিউজ* প্রভৃতি। তৎকালীন সময়ে বর্তমানকালের মত বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও ছিল না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেডিও পাকিস্তান এবং পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানপন্থি। বিপরীতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই ছিল বেসরকারি মালিকানাধীন এবং সেখানে প্রকাশিত সংবাদ মালিকপক্ষের রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে।

২. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন এবং আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০.৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করেন।[১] তিনি ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক

আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। এছাড়া ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বরখাস্ত করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দলসমূহ বিলুপ্ত করা হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়া হয়।[২] ৮ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণে আইয়ুব খান দাবি করেন রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার কোন ইচ্ছাই কখনো তার নিজের বা সেনাবাহিনীর ছিল না। কিন্তু ২৮ অক্টোবর তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৩] আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর 'মৌলিক গণতন্ত্র' অধ্যাদেশ জারি করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শাসনে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে সেটি তুলে ধরা। মৌলিক গণতন্ত্র বলতে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়।[৪] ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারা দেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০,০০০ সহ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি 'The Presidential (Election and Constitutional) Order-1960' জারি করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাকে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে একটি সংবিধান রচনার অধিকার প্রদান করবে। এভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গোপন ব্যালটে হ্যাঁ-না ভোট দিয়ে আইয়ুবকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন।[৫]

৩. আইয়ুব আমলে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ও সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ার সাথে সাথে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অঙ্গনও নির্জীব হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে এবং সংবাদপত্র অঙ্গনে আসে গতি। বাঙালি জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সামরিক জান্তার অবজ্ঞাসূচক মনোভাব এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করা হলো –

৩.১ রোমান হরফ প্রবর্তন প্রয়াস

পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আইয়ুব খান পাকিস্তানকে একজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে দুই প্রদেশের মধ্যে একটি যোগাযোগের ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।[৬] আইয়ুব খানের এই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে ক্ষমতা দখলের পরপরই সরকারি উদ্যোগে 'রোমান হরফ প্রবর্তন' প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত

জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ *আজাদ* পত্রিকার মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি করে গঠিত পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশ ১৯৫৮ সালে সেটি প্রকাশ করা হয়। এই সুপারিশ মালা ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে দাখিল করা হয়েছিল এবং সরকার তা প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিল।[৭] ভাষা কমিটি উক্ত প্রতিবেদনে 'সহজ বাংলা' প্রচলনের সুপারিশ করতে গিয়ে কিছু নমুনা তুলে ধরেছিল। *আজাদ* এ সময় পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিভিন্ন সাহিত্য সংস্থা সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে থেকে। যেমন- ১৯৫৮ সালের ১১ মে কবি গোলাম মোস্তফার বাড়িতে 'রওনক সাহিত্য সংস্থা'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি বাংলা ভাষাকে 'পাক-বাংলা' ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে এতে অধিক পরিমাণে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দ যোগ করার ওপর গুরুত্ব দেন। *আজাদ* এই সভা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে মন্তব্য করে:

> অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ভাষা হইতে হিন্দু ভাবধারার বাহক সংস্কৃত শব্দগুলো বর্জন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ইহার সংস্কার সাধন সময়-সাপেক্ষ হইলেও পাক-বাংলা ভাষার রূপান্তর অবধারিত এবং ভাষার রূপান্তর স্বাভাবিকভাবে আসিলেও আমাদের লেখক সমাজের এ বিষয়ে সচেতন দৃষ্টির এবং জাতীয় সাহিত্যকে বেগময়ী ও সমৃদ্ধ করিতে আমাদের মুখের ভাষাকেই অবলম্বন করা উচিত।[৮]

দ্বিতীয় সভায় 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী। সভায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ত্যাগ করে বাংলা ভাষার সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং *আজাদ* ১৯৫৮ সালের ২০ জুলাই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এভাবে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ও রক্ষণশীল আদর্শের ভাবধারার ভিত্তিতে গঠিত রওনক সাহিত্য সংস্থার বিভিন্ন তৎপরতা ও বাংলা ভাষার সংস্কার প্রস্তাব *আজাদ*-এ প্রচার পায়। বস্তুত প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই *আজাদ* পত্রিকায় ইসলাম ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। পত্রিকাটি 'আজাদের আত্মনিবেদন' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়তেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে, '... তিন কোটি মুছলমানের সত্যিকার সেবা ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে দৈনিক আজাদ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম।'[৯] *আজাদ* ছাপা হতো ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে এবং মুদ্রিত হতো মোহাম্মদী প্রেস থেকে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এতে পূর্ব বাংলার ঘটনাবলিই স্থান পেত। এটি পত্রিকার স্বাধীন মত প্রকাশের পথে ছিল একটি বড় বাধা।[১০] কলকাতা থেকে *আজাদ*-এর সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। এতে উল্লেখ করা হয়, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। মওলানা আকরম খাঁ পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় *আজাদ*-এর প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে এর প্রভাব লক্ষণীয়। অনেক

ক্ষেত্রেই পত্রিকাটির নীতি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাছাড়া সমগ্র পাকিস্তান আমলেই পত্রিকাটির নীতি ছিল বৈপরীত্যমূলক।

সামরিক শাসনের মধ্যেও প্রতিবাদের সব পথ রুদ্ধ থাকলেও *ইত্তেফাক* বাংলা ভাষা সংস্কার প্রয়াসের সমালোচনা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি একনিষ্ঠ পত্রিকাটি প্রথমদিকে সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রকাশিত হয়।[১১] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং এর মালিক-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। সোহরাওয়ার্দীর অনুসারি মানিক মিয়া *ইত্তেফাক*-কে সোহরাওয়ার্দীপন্থি করে তোলেন।[১২] সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা, সাম্প্রদায়িকতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির উদ্দেশ্যে *ইত্তেফাক*-এর 'রাজনৈতিক হালচাল' ও পরবর্তী সময়ে 'মঞ্চে নেপথ্যে' উপ-সম্পাদকীয় কলামে 'মোসাফির' ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতে থাকেন মানিক মিয়া।

ইত্তেফাক ১৯৫৯ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শীর্ষক দুটো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এছাড়া *ইত্তেফাক* হরফ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশের সংবাদ প্রকাশ করেও জনমত সংগঠনে ভূমিকা পালন করে। যেমন - ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির একটি অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদের সংবাদ *ইত্তেফাক* পত্রিকায় উঠে আসে।[১৩] এসব সমালোচনা উপেক্ষা করে শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট সরকারের কাছে দাখিলকৃত সুপারিশে বাংলা ও উর্দু ভাষার উন্নয়ন সাপেক্ষে রোমান হরফ প্রবর্তনের পক্ষে মত দেয়।[১৪] এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু হয়। ১৯৬০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সকল প্রতিবাদ সমাবেশে এবং ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রদের প্রতিবাদ বিক্ষোভের অন্যতম বিষয় ছিল সরকারের এই রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস। প্রতিবাদের মুখে সরকার এই বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণে বিরত থাকলেও ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন উপলক্ষে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সাথে এক বৈঠকে আইয়ুব খান রোমান হরফ প্রবর্তনের বিষয়টি আবারও সামনে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, 'কলকাতার সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের ভাষার হরফ বদলাতে হবে।'[১৫] আইয়ুব খানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় *আজাদ*- এর প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয়তে। এ পরিপ্রেক্ষিতে *আজাদ* বাংলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব মুক্ত করার ওপর জোর দেয়। ১৯৬২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 'বাংলা ভাষার উন্নয়ন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, 'বাংলা ভাষা হইতে পশ্চিম বঙ্গের অন্ধ অনুকরণের ছাপ মুছিয়া দেওয়া এবং দুর্ব্বোধ্য দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃতি শব্দ বর্জন করা হইলে ইহা সহজ ও স্বভাবিক হইয়া উঠিবে।'[১৬] কলকাতা থেকে প্রকাশিত গল্প উপন্যাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

প্রচারণা চালানোর অভিযোগ তুলে *আজাদ*, কলকাতার বই নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ৫ জুন 'সাহিত্য ও তমদ্দুন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> ... এখানকার বইয়ে আল্লা, পানি প্রভৃতি শব্দ থাকে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিক্রেতা ও প্রকাশকরা এসব বই জাত যাওয়ার ভয়ে ছুইতে চায় না। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন গল্প উপন্যাসের বই নাই যাহাতে পৌত্তলিকতা ও পাকিস্তান বিদ্বেষ নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বই আসা এখানে বন্ধ হয় নাই।[১৭]

আজাদ কলকাতার গল্প উপন্যাস এখানে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং এখানে কলকাতার ছাপা হওয়া বইয়ের কপি বাজার থেকে তুলে নেয়ার প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' আয়োজন করলে *আজাদ* সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> ... বাংলা ভাষা যখন আমরা গ্রহণ করিব, তখন আমরা আমাদের বাংলা জবানকেই গ্রহণ করিব, অন্যের বাংলা ভাষাকে আমাদের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিব না। ... পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিধর্মী, বিগত দিনের অভিধান ভিত্তিক এবং জীবনে অপ্রচলিত বাংলা পাক-বাংলা হইবে না, ইহাই আমরা বলিতে চাই। ... মুসলমানের ভাষা আরবী ফারসীবহুল।[১৮]

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা ভাষার সংস্কারের কথা বললেও ১৯৬৩ সালের ২৮ নভেম্বর 'বাংলা ভাষা ও রেডিও পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* একই সাথে রেডিও পাকিস্তানে উর্দুর সাথে সাথে বাংলা ভাষার প্রচারের ওপর জোর দেয়।[১৯]

৩.২ বাংলা একাডেমির মাধ্যমে বানান সংস্কার

ষাটের দশকে বাংলা ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখানকার সংস্কৃতির ওপর বেশ কয়েকবার আঘাত হানা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি স্থাপন করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে 'মুসলমানিত্ব' প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেমন - নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'- এর একটি লাইন ছিল - 'নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান'। কিন্তু পাঠ্য বইতে সেটি সংশোধন করে লেখা হয়- 'সজীব করিব গোরস্থান'। কমিটি প্রচলিত অক্ষর ব্যবহার করে এবং যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব পরিহার করে একটি বর্ণমালা প্রণয়নে সচেষ্ট হন। ১৯৬৩ সালের ৩১ মে *ইত্তেফাক* ও *আজাদ* বাংলা একাডেমির এই বানান সংস্কার প্রস্তাব বিস্তারিত প্রকাশ করে। তবে বাংলা একাডেমির এই প্রস্তাবিত বানান রীতি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি কমিটির অনেকেই এই রীতির সাথে একমত পোষণ করেননি।

৩.৩ লেখক-সাহিত্যকদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা

সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিফলনের পাশাপাশি সামরিক শাসনের পক্ষে লেখকদের সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ'। লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সাধারণ সম্পাদক হন ড. কাজী মোতাহার হোসেন। এর মুখপত্র হিসেবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যার নাম ছিল *পূরবী* (১৯৬০), পরে নাম রাখা হয় *লেখক সংঘ পত্রিকা* (১৯৬১-৬২)। *পূরবী* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা, সহ সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক মুহম্মদ এনামুল হক। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু থেকেই এর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। গোলাম মোস্তফাকৃত ইকবালের- 'শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া'র অনুবাদ, সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'কায়কোবাদ' নিয়ে একটি প্রবন্ধ ইত্যাদি ছিল প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু।[২০] পরে গোলাম মোস্তফার সম্পাদনায় *লেখক সংঘ পত্রিকা*'র প্রথম সংখ্যার মূল রচনাটি ছিল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর - 'ফারসীর বাংলা দখল'।[২১] এই সংখ্যাটিতেও ইকবালের একটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। লেখক সংঘের উদ্যোগে কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফররুখ আহমেদের *নৌফেল ও হাতেম*।[২২]

এভাবে সামরিক শাসন জারির পর দেশের রাজনীতিবিদদের ওপর যখন অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়, তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং একজন প্রধান সম্পাদককে (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) কারাভোগ করতে হয় তখন মত বা দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান লেখকদের অনেকেই সামরিক সরকার পৃষ্ঠপোষিত সভা সেমিনারে যোগ দিয়ে, পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে প্রকারান্তরে সামরিক সরকারকেই সাহায্য করেছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ১৯৭১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শিল্পীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়টি তুলে ধরেন। পরের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি নিয়ে *ইত্তেফাক*, *আজাদ* এমনকি *সংগ্রাম* ও *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[২৩]

তবে এর বিরুদ্ধ স্রোতেও অনেকে ছিলেন। লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে ১৯৬৮ সালের ৫-৯ জুলাই পাঁচদিনব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের আয়োজন ছিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের ওপর। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সভার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. আনিসুজ্জামান। তিনি উল্লেখ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাতা এবং সে কথার গুরুত্ব কারও পক্ষেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব না।[২৪] স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানপন্থি পত্রিকাগুলো এটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। অনুষ্ঠানের পরদিন *পয়গাম* পত্রিকায় বিষয়টির সমালোচনা করে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়। 'সীমাহীন ধৃষ্টতা' শীর্ষক ঐ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র প্রশ্নের কবর বা শ্মশান রচিত হইয়া গিয়াছে। ... রবীন্দ্র দিবস পালনের মধ্য

দিয়ে যেভাবে রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস পালিত হইয়াছে তা তৌহিদবাদী পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর হামলা বিশেষ এবং পাকিস্তানবাদী মানুষ মাত্রকেই আজ এই হামলা রুখিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে।'[২৫] এখানে বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর মোনায়েম খানের মালিকানায় এবং মুজিবর রহমান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *পয়গাম*। পত্রিকাটির নীতি ছিল সাম্প্রদায়িক।[২৬]

পাকিস্তানের ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো এই উৎসবকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পাকিস্তানের ধনাঢ্য বাইশ পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ১৯৬৪ সালে গঠন করা হয় ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট। ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর প্রকাশ করা হয় বাংলা পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান*। পাক আর্টস মুদ্রণালয়, ৫০ টিপু সুলতান রোড থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দু কবি আহসান আহমদ আশককে ট্রাস্টের সদস্য করে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর মহাব্যবস্থাপক করা হয়। *আজাদ*-এর পূর্বতন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ট্রাস্ট মালিকানাধীন হলেও প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত অনেকেই *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় যোগ দেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক সময়ের বামপন্থি নেতা মোজাম্মেল হক, কবি শামসুর রাহমান, সানাউল্লাহ নুরী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই চলিত ভাষা ব্যবহার করে যেখানে ঢাকার অন্যসব দৈনিক পত্রিকা সাধু ভাষা ব্যবহার করত। প্রগতিশীল সাংবাদিকরা পত্রিকাটির সাথে জড়িত হওয়ার কারণেই পত্রিকাটিতে বাঙালি জনমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়। এছাড়া আজন্ম বাঙালি বিরোধী পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে ট্রাস্ট।[২৭]

৩.৪ রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতা

১৯৬১ সাল ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ। তবে বাঙালিদের মধ্যে যারা পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তাঁদের সকলেই শুরু থেকে এখানে রবীন্দ্র - জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন বা নিরুৎসাহী ভূমিকা পালন করেন।[২৮] ঢাকার পত্রিকাগুলোও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পক্ষে ও বিপক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করে।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল *আজাদ*। পত্রিকাটি এ সময় তীব্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিল-মে (বৈশাখ ১৩৬৮) মাসে *আজাদ* পত্রিকার প্রায় বারটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু এবং তার সাহিত্যকে পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থি বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল সংখ্যায় পত্রিকাটি 'রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানে মন্তব্য করা হয়, '... একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারি ও ভক্ত। তাঁদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং

বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগে তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।'[২৯]

এরপর ২৬ এপ্রিল থেকে পরপর কয়েকদিন পত্রিকাটিতে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতা করে কোনো না কোনো সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, পৃথক প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালের ২৬ এপ্রিল 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে যে, মুসলমানদের কাছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালন কোহেনদার ডাকের সমান আর এ ডাকে সাড়া দেয়ার অর্থ হল নিশ্চিত মৃত্যু।[৩০] একইদিন 'রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী' শিরোনামে প্রকাশিত উপ-সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্রচর্চাকে পাকিস্তানের মৌল চেতনা তথা ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থি হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয় যে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর ছদ্মবেশে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের ওপর একটি নতুন হামলার সুপরিকল্পিত আয়োজন হচ্ছে।[৩১] ১২ মে *আজাদ*-এ মওলানা আকরম খাঁ 'রবীন্দ্রনাথের হোরিখেলা' প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপক্ষে অভিযোগ করেন যে, তিনি মুসলমানদের মমতার চোখে দেখেননি।[৩২]

আজাদ পত্রিকার এই রবীন্দ্র বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে পাল্টা যুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক সংবাদ*। বস্তুত আইয়ুব আমলে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের বিপরীতে *দৈনিক সংবাদ* কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৫১ সালের ১৭ মে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *সংবাদ*। তখন এর সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবীর যিনি নির্দলীয় স্বাধীন মতের কাগজ বের করার লক্ষ্যে সংবাদ-এর সাথে যুক্ত হন।[৩৩] কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পত্রিকাটি আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সম্পাদক খায়রুল কবীরের মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পত্রিকাটি কিনে নেয়। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে মুসলিম লীগের সমর্থক এবং ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পত্রিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আসেন আহমেদুল কবীর। সম্পাদক হয়ে আসেন জহুর হোসেন চৌধুরী। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় কোম্পানি- 'দি সংবাদ লিমিটেড'। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন আহমেদুল কবীর ও নাসিরউদ্দীন আহমদ। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। ১৯৬১ সালে ঢাকায় আইয়ুব খানের সাথে পত্রিকা সম্পাদকদের একটি বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন, '... আমাদের ইহাই বড় দুর্ভাগ্য যে, কি আমলা, কি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যারাই পূর্ব পাকিস্তানে কার্যোপলক্ষে আসিয়াছেন, তারাই এমন একটা ভাব দেখাইয়াছেন যে, আমাদের মুসলমান করা এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়াই যেন তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব।'[৩৪] ফলে পত্রিকাটির নীতিতেও এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রভাব পাওয়া যায়। পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ করে। এ রকম একটি পুনর্মুদ্রিত রচনা হলো কবি গোলাম

মোস্তাফার 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ'। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, শ্রাবণ ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধে বলা হয় যে, রবীন্দ্র রচনাবলির কোথাও ইসলাম বিদ্বেষ খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং তার কথায় এত ইসলামি ভাব ও আদর্শ আছে যে, তাকে অনায়াসে মুসলমান বলা যায়।[৩৫] এছাড়া পত্রিকাটি আবুল কালাম শামসুদ্দীনের *দৃষ্টিকোণ* গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তিবাচক মন্তব্য উদ্ধৃত করে।[৩৬] এসব উদ্ধৃতি পুনর্মুদ্রণের উদ্দেশ্য ছিল - রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নে উল্লিখিত লেখকদের স্ববিরোধিতাকে তুলে ধরা। ১৯৬১ সালের ৭ মে *সংবাদ* 'রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সংখ্যা' প্রকাশ করে। এখানে মোতাহার হোসেন চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তথাকথিত রাজনীতির ওপরে স্থান দেয়ার আহ্বান জানান।[৩৭]

সংবাদ-এর পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসে *ইত্তেফাক*। 'ভীমরুল' ছদ্মনামে আহমেদুর রহমান *ইত্তেফাক* পত্রিকায় তার জনপ্রিয় কলাম 'মিঠেকড়া'-তে একটি দীর্ঘ নিবন্ধে অত্যন্ত ধারালো ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এবং প্রচুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহকারে *আজাদ* এর রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারণার জবাব দেন। তিনি মন্তব্য করেন:

> কিন্তু ঢাকেশ্বরী রোডের 'এছলাম ব্যবসায়ী' সহযোগী এক সময়ে নজরুলকেও কাফের বলিয়া গণ্য করিতেন। ... সারা জীবন ... রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যে এছলামের 'প্রধান মূলমন্ত্র ও বিশিষ্টতার' মহত্তম রূপায়ন দেখিয়া, রবীন্দ্র কাব্যে 'কোরানের প্রতিধ্বনি' শুনিয়া এবং রবীন্দ্রনাথকে প্রায় হাজী বানাইয়া অবশেষে এই বৃদ্ধ বয়সে সহযোগী আবিষ্কার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'মুসলমান বিদ্বেষী'।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আহমেদুর রহমান। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন নিয়ে পত্রিকায় এই বিতর্কের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকায় উৎসব পালনে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। একটি হলো কেন্দ্রীয় - এর সভাপতি ছিলেন তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এম. মাহবুব মুর্শেদ, অন্য দুটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং ঢাকা প্রেস ক্লাবের। ১৯৬১ সালের ৭ মে থেকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে চারদিনব্যাপী (২৪-২৭ বৈশাখ) আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া ১১ ও ১২ বৈশাখ ডাকসু'র উদ্যোগে কার্জন হলে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয়।[৩৯]

ইত্তেফাক এসব অনুষ্ঠানের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। যেমন - ডাকসুর অনুষ্ঠানে কবি সুফিয়া কামালের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সুফিয়া কামাল মন্তব্য করেন, 'রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও উত্তর বাংলারই কবি। তাহার সোনার তরী পূর্ব বাংলার পদ্মা ও মেঘনাতেই বাহিত হইয়াছিল। আজও কবির স্মৃতি নিয়া বাঁচিয়া আছে শিলাইদহ শাহজাদপুর প্রভৃতি স্থান।'[৪০] *ইত্তেফাক*-এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ব্যাপক লোক

সমাগমের মাধ্যমে সফলভাবে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এভাবে অনুষ্ঠানের ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করার মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়াস লক্ষণীয়।

ইত্তেফাক-এর পাশাপাশি *দৈনিক সংবাদ* রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে সংস্কৃতিকর্মীদের ঐক্য ও মূল্যবোধের বিষয়টি *সংবাদ*-এর প্রতিবেদনে উঠে আসে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে বাঙালি জাতি একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে। বাঙালি জনগণের এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে ১৯৬১ সালের ৮ মে *দৈনিক সংবাদ* তাঁদের সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করে:

> পূর্ব পাকিস্তানের চিন্তাবিদ, লেখক, শিল্পী ও গায়ক সমাজ এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানসমূহকে অভূতপুর্ব প্রাণস্পন্দনে ভরপুর করিয়া দিতেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের আবেদন এত সার্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মেহেনতি মানুষ, সাধারণ নরনারী শিশুকেও ওইসব অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোগতাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে।[৪১]

ঢাকার মূল অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করার পাশাপাশি *সংবাদ* সারা দেশে কিভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে সেই বিষয়টিও তুলে ধরে। ১৯৬১ সালের ১২-১৬ মে পর্যন্ত *সংবাদ* এই বিষয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশ করে।[৪২] এর বিপরীতে রবীন্দ্রবিরোধী মহল জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যাপারে তাদের বিরোধিতার কথা প্রচার করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে আলোচনা সভার আয়োজন করে এবং বিষয়টি *আজাদ* পত্রিকায় প্রচারণা পায়।[৪৩] ঢাকা জেলা পরিষদ হলে আয়োজিত এ রকম একটি আলোচনা সভা নিয়ে *আজাদ* ১৯৬১ সালের ৮ মে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৪৪]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের সাফল্যকে স্থায়ী ভিত্তি প্রদানের জন্য কতিপয় সাংস্কৃতিক কর্মী একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং আত্মপ্রকাশ ঘটে ছায়ানট নামক সংগঠনটির। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সহ-সভাপতি ছিলেন *সংবাদ*-এর সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী। এছাড়া অন্যতম সদস্য ছিলেন *ইত্তেফাক* পত্রিকার আহমেদুর রহমান (ভীমরুল)। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৬০ এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ধারা ক্রমে বিকাশ লাভ করেছিল তাতে এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অবদান অপরিসীম।[৪৫] ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো এই অনুষ্ঠানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। এমনকি ষাটের দশক জুড়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী এবং বাঙালিত্বের গৌরব জাহির করার প্রবৃত্তি না থাকা সত্ত্বেও *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে।[৪৬]

৩.৫ রবীন্দ্র সাহিত্য, সংগীত ও সাম্প্রদায়িকতা

১৯৬৬-৬৭ সালে রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে নতুন ভাবে বিতর্ক শুরু হয়। একদিকে পাকিস্তানের সরকারি প্রচার মাধ্যম রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার ছিল সীমিত, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এটিও বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ অবসানেও রবীন্দ্র সংগীতের ওপর এই অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে। ১৯৬৬ সালে টেলিভিশন এবং রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা ও অন্য কয়েকটি কেন্দ্র থেকে পুনরায় রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার শুরু হয় যেটি সপ্তাহে দু-চারটি গান প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে *ইত্তেফাক* সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালের ৯ মে *ইত্তেফাক* মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'সুরের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। লেখক রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন:

> ... এ কথা বলাই বাহুল্য যে, রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র সাহিত্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্য ভারতের একার সম্পত্তি নয়। ... অন্যের প্রতি রাগ করে বাংলা বা হিন্দী - উর্দু সাহিত্যের যেকোনো অংশকে বর্জন করা মানে শুধুশুধি নিজেদের বঞ্চিত করা। আর যে যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করব সেই একই যুক্তিতে তো আরো অনেক কিছু বর্জন করতে হয় যেমন নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির প্রমুখের রচিত সাহিত্য, কেননা বর্তমানে তারা ভারতীয় নাগরিক। [৪৭]

বরাবরের মত *আজাদ* নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। সরাসরি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে *আজাদ* দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করে পত্রিকাটি হিন্দু সংস্কৃতির অনুকরণ না করার আহ্বান জানিয়ে বলে:

> ... এখানে বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির অনুকরণের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের নিদর্শনটা লক্ষ্য করিলেই সবচেয়ে বেশী উপকার হইবে।... দ্বিজাতিতত্ত্ব নিছক মন্ত্রশক্তি ছিল এবং নির্ব্বোধের মত গোটা মোছলেম সমাজ তাহা মানিয়া নিয়াছিল, তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না, ইহা মনে করার কোনো কারণ নাই।[৪৮]

একটি পর্যায়ে *আজাদ* আরও বেশি রক্ষণশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রীদের নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানায়। এ ক্ষেত্রে পত্রিকাটি পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রীদের সব ধরনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করার উদাহরণ তুলে ধরে। নৃত্য ও সংগীতকে ইসলাম বিরোধী আখ্যায়িত করে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এ দিকে যথাসময়ে দৃষ্টিদান করিয়াছেন এবং সংস্কৃতির নামে অনুষ্ঠিত এছলাম বিরোধী কার্যকলাপ হইতে সমাজের ভাবী মাতৃসমাজকে উদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন। ... সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা স্বীকার না করার কোনো উপায় নাই।[৪৯]

আজাদ তার বৈপরীত্যমূলক নীতির পুনঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরোধিতা করে। ১৯৬৭ সালের ২০ মার্চ 'আমাদের জাতীয় সংহতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে, '... কোনো কোনো মহল আরবী লিপির সাহায্যে বাংলা লেখার কথা বলিয়া থাকেন। এই মতের স্বপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন - ইহা গ্রহণ করা হইলে যে কতগুলি জটিলতার সৃষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখন আর এ প্রশ্ন না উঠাই বাঞ্ছনীয়।'[৫০]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন বলেন যে, রেডিও পাকিস্তান থেকে 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিপন্থী' রবীন্দ্রনাথের গান প্রচার করা হবে না।[৫১] এর আগের দিন ২১ জুন পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুরও পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও পহেলা বৈশাখ পালনের নামে 'বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে'র ওপর তার উদ্বেগ ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।[৫২] খাজা শাহাবুদ্দীন ও খান এ সবুরের বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে *পাকিস্তান অবজারভার* ২৩ জুন 'Broadcast ban on Tagore' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। খবরে বলা হয়, '... That the songs by poet Rabindranath Tagore which he termed as 'against Pakistan's cultural values' would not be broadcast in future and the use of other songs would songs would also be reduced.'[৫৩]

পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* সংবাদটি প্রকাশ করে, 'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হবে না' শিরোনামে। সংবাদে বলা হয়, 'কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে।'[৫৪] সরকারের তরফ থেকে এই সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে কোনো সংশোধনী বা প্রতিবাদ জানানো হয়নি। এ ঘটনাকে সামনে রেখে সংবাদপত্রে বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির ঘটনা ঘটে। ২৫ জুন *ইত্তেফাক*-এ এক বিবৃতির মাধ্যমে ১৮ জন লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক সরকারি সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, '... রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।'[৫৫] এই বিবৃতির পাল্টা আরেকটি বিবৃতি *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ২৯ জুন ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক। তারা ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির সমালোচনা করে

বলেন, '... বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ...এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।'[৫৬]

একইদিন ৪০ জন বুদ্ধিজীবীর দ্বিতীয় আরেকটি বিবৃতি *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথই যে তার এক প্রবন্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেছেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, '... উপর্যুক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয় অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতি বিরোধী বলেও মনে করি।'[৫৭] ৪০ জন বিবৃতিদাতাদের অন্যতম ছিলেন *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তবে *আজাদ* বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু করে আরও একমাস আগে থেকে মে মাসে। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে নজরুল ইসলামকে দাঁড় করানোর চেষ্টা থেকে *আজাদ* কবির পশ্চিম বাংলায় থাকার বিরোধিতা করে। সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, '... নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের জাতীয় কবি না হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে মুসলিম জাগরণের কবি এবং তাহার জীবন সাহিত্য সাধনা পাকিস্তানী পরিবেশেই বিশেষ ভাবে খাপ খাইতে পারে।'[৫৮] একজন মানবতাবাদী কবির পরিবর্তে *আজাদ* নজরুল ইসলামকে মুসলিম জাগরণের কবি হিসেবে প্রচার করে। বাঙালি জাতির জয়গানের পরিবর্তে নজরুল মুসলিম জাগরণের কথা প্রচার করেছেন এমনটি দাবি করে *আজাদ* মন্তব্য করে, 'এককালের অধ্যয়ন যদি তাঁহার থাকিত এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিষ্ঠাবান যদি তিনি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দানের পাত্র পূর্ণতর হইয়া উঠিতে পারিত। এ ত্রুটির জন্যই পাকিস্তান তাহাকে হয়ত কোনদিনই জাতীয় কবি বলিয়া মানিয়া নিতে পারিবে না। তবে মোছলেম জাগরণের অবিসংবাদিত নকীব হিসাবে ... পাকিস্তানই তাঁহার জন্য উপযুক্ত স্থান।'[৫৯]

খাজা শাহাবুদ্দীনের ঘোষণার সমর্থনে *আজাদ* ১৯৬৭ সালের ৩০ জুন রবীন্দ্র সাহিত্য ও পূর্ব্ব পাকিস্তান' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাত্র একাংশের কবি - বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়:

> বাংলা সাহিত্যের সেই চিরস্থায়ী ব্যবধান ভাঙ্গার কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভাকে কখনো নিয়োজিত করেন নাই। ... বাংলার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে তাঁহার ঔৎসুক্য ছিল না, বরং মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণা লইয়া যে একপেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সীমানা ভাঙ্গার কিছুমাত্র আগ্রহও তিনি দেখান নাই।[৬০]

একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরেকটি বিবৃতি *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে ৩০ জন মওলানা এই বিবৃতিতে বলেন, '... রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হতেই এ সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও টেলিভিশনকে

পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।’[৬১] একই বিবৃতি *পয়গাম* পত্রিকায় কিছুটা আলাদাভাবে আসে। এখানে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ বহু সংগীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির ও যৌন ভোগলালসার জয়গান গাহিয়াছেন।’[৬২] শিল্প-সংস্কৃতির সাথে সরকারিভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দিয়ে জোর করে রবীন্দ্র সংগীতের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর আদায় করা হয়। বেতার শিল্পীদের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *পাকিস্তান অভজারভার* পত্রিকার ১৯৬৭ সালের ২ জুলাইয়ের প্রতিবেদন থেকে। পত্রিকাটি এ বিষয়ে শিরোনাম করেছিল, ‘No Signature, No Programme – Radio Pakistan’s Threat’।[৬৩]

শাহাবুদ্দীনের বক্তব্য নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অব্যাহত থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ সালের ২৮ জুন *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এতে ‘Clarification’ শিরোনামে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, মন্ত্রী তার বিবৃতিতে কেবলমাত্র সেসব গানই প্রচার বন্ধ করার কথা বলেছেন, যেগুলো পাকিস্তানের সংস্কৃতির মূল্যবোধের পরিপন্থি।[৬৪] ৫ জুলাই খাজা শাহাবুদ্দীন তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বলেন যে, তার বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬৫] সমস্ত সরকারি তৎপরতা ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঢাকার ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ঐকতান এবং আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্মিলিতভাবে ২২ শ্রাবণ ১৯৭৪ (৮ আগস্ট, ১৯৬৭) রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়।

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ৮ আগস্ট অর্থাৎ ২২ শ্রাবণের সংখ্যায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ নেই। এ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের তামদ্দুনিক আন্দোলনের সম্পাদক বেনজীর আহমেদের ‘বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের চেষ্টা প্রতিরোধের আহ্‌বান’ শিরোনামে একটি বিবৃতি ছাপা হয়। এ সংবাদটি থেকেই *দৈনিক পাকিস্তান*-এর পাতায় অনুষ্ঠানের উদ্যোগটির কথা জানা যায়।[৬৬] পরে ১০ আগস্ট (২৪ শ্রাবণ) দৈনিক পাকিস্তানের তৃতীয় ও শেষ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠানটির উদ্যোগের কথা জানা যায় ছোট এক কলামব্যাপী সংবাদের মাধ্যমে। এর দুই দিন পর ১৯৬৭ সালের ১২ আগস্ট ‘জাতীয় সংস্কৃতির চরিত্র’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পত্রিকাটি। এতে পরোক্ষভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে বলা হয়: ‘বাইরের যা কিছু মহৎ এবং সুন্দর একটা গতিশীল সংস্কৃতি তাকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করিয়া লইবে, নিজের রঙে তাকে রঞ্জিত করিবে। কিন্তু তার মধ্যে তলাইয়া গিয়া নিজের চরিত্র বিসর্জন দিবে না।’[৬৭] যদিও পুরো সম্পাদকীয়তে কোথাও সরাসরি কবি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা হয়নি কিন্তু যেটি লেখা হয়েছে সেটি ছিল *আজাদ* পত্রিকার মূল সুরের সমর্থক।

ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে একে চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। ভাসানীর

নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হওয়ার পর *দৈনিক সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবীর ন্যাপে যোগদান করেন।[৬৮] অবিভক্ত ন্যাপে দৈনিক *সংবাদ* ধীরে ধীরে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও মহীউদ্দিন আহমদ উপদলের সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে ন্যাপের আনুষ্ঠানিক বিভক্তির পর অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থি অংশের মুখপত্রে পরিণত হয় *সংবাদ*।[৬৯] ন্যাপ সমর্থিত *সংবাদ* ১৯৬৭ সালের ২ জুলাই সংখ্যায় খাজা শাহবুদ্দীনের বক্তব্যের সমালোচনার পাশাপাশি রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে বিতর্ককে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করে।[৭০] ১৯৬৭ সালে অধ্যাপক অজিত গুহের উদ্যোগে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে 'চারণিক' নামে জগন্নাথ কলেজ ভিত্তিক একটি সংগঠন গঠিত হয়। চারণিক ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে বাংলা একাডেমিতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। দু-একটি পত্রিকা এ বিষয়ে সামান্য সংবাদ প্রকাশ করলেও সংবাদ বিস্তারিতভাবে অনুষ্ঠানের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশ করে।[৭১]

কবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালনের সংবাদ নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় *পাকিস্তান অবজারভার*। *আজাদ* পত্রিকার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি অবলম্বন করে *পাকিস্তান অবজারভার* ৮-১১ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিটি খবর গুরুত্ব ও প্রশংসার সাথে এবং বিরোধী বক্তব্য পরিহার করে প্রকাশ করে। তবে *পাকিস্তান অবজারভার* অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। ট্রাস্ট মালিকানাধীন অপর পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* ২২ শ্রাবণ (রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী) উপলক্ষে কোনো সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি।

৩.৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল নতুন করে বাংলা বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে একটি কমিটি তৈরি করেছিল।[৭২] ফলে ভাষা সংস্কারের প্রশ্নে আবার বিতর্ক শুরু হয় এবং সংবাদপত্রগুলো দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে বিতর্কে অংশ নেয়। রবীন্দ্র সংগীতের বিরোধিতা করলেও ভাষা সংস্কারের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সমালোচনা করে *আজাদ*। 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গে' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যে, ভাষা বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই ভাষার সংস্কার ঘটে ফলে এর জন্য কোনো আইন করার প্রয়োজন নেই। বরং কৃত্রিম উপায়ে ভাষাকে সংস্কার করতে গেলে নতুন কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটে।[৭৩]

সংবাদ সরকারের ভাষা সংস্কারের উদ্যোগের সমালোচনা করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি এর প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচির খবরও প্রকাশ করতে থাকে। যেমন - ১৯৬৮ সালের ১২ আগস্ট সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের মাধ্যমে ডাকসু সভা ও বিক্ষোভ মিছিল বের করলে ১৩ আগস্ট *সংবাদ* সেটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ট্রাষ্ট মালিকানাধীন পত্রিকা *মর্নিং*

নিউজ বাংলা ভাষা সংস্কার প্রয়াসকে সমর্থন জানায়। *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ভাষা সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন লেখকের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মূল্যায়ন

পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা তথা সমন্বয়পন্থি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল সাম্প্রদায়িক মহল যারা বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র সংগীত ইত্যাদি বিষয়কে পাকিস্তান বিরোধী এবং হিন্দুয়ানি বলে গণ্য করত। এই সাম্প্রদায়িক শ্রেণির মুখপত্র ছিল *মর্নিং নিউজ, ও পয়গাম*। *আজাদ*-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে ধর্মীয় প্রভাব ছিল জোরালো। অপরদিকে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন ও বিধি-নিষেধের মধ্যেও *ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি তথা অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবস্থান নেয়।

ভাষা আন্দোলনের মতই আইয়ুব আমলে *আজাদ* পত্রিকার দ্বিমুখী চরিত্র দেখা যায়। পত্রিকাটি একদিকে রবীন্দ্র সাহিত্য এবং রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরোধিতা করে কিন্তু একই সাথে বাংলা বানান সংস্কারের বিপক্ষেও অবস্থান নেয়। রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *মর্নিং নিউজ* পত্রিকাদ্বয় *আজাদ*-এর মত সংকীর্ণ অবস্থান নেয়। পাশাপাশি *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *মর্নিং নিউজ* বাংলা বানান সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে একাধিক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল ধারার বুদ্ধিজীবী - যারা বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কারের পক্ষে ছিলেন তারাও *দৈনিক পাকিস্তানকে* ভিত্তি করে প্রচারণা চালান ও বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* এ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা রাখে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ঢাকার পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এদের বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে। ফলে পাঠক যারা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী নন তারাও রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হন। এভাবে একটি জাতীয় জাগৃতির বাহন হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন, বাংলা ভাষার সংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতা, সরকারি প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিয়ে বিতর্ক কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা ছিল না, ছিল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবাদ। *ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার* এই প্রতিবাদে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। আইয়ুব আমলে ভাষা সংস্কার ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক এক বাঙালি জাতীয়তাবাদ লালিত ও বিকশিত হয়। এই জাতীয়তাবাদ বিকাশে এবং ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত মোকাবেলায় ঢাকার পত্রিকাগুলো তাদের নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

---

১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১ (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮২), ১ ।

২. *The Dhaka Gazette, Extraordinary*, Published by Authority, 12 November, 1958, 2669-2672.

৩. A. S. M. Shamsul Arefin (ed.), *Bangladesh Documents 1971*, Part 1 (Dhaka: Somoy Prakashan, 2015), 123.

৪. প্রথম স্তরে ছিল - ইউনিয়ন কাউন্সিল, দ্বিতীয় স্তরে - থানা কাউন্সিল, তৃতীয় স্তরে - জেলা এবং চতুর্থ স্তরে বিভাগীয় কাউন্সিল। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৩০-৩২ ।

৫. মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে দেখুন হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৪৮-৬১ ।

৬. বিস্তারিত- Mohammad Ayub Khan, *Friends not Masters: A Political Autobiography* (London: OUP, 1967), 102

৭. মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৪), ১৪১ ।

৮. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানপন্থি কিছু লেখক ও সাহিত্যিক 'রওনক সাহিত্য গোষ্ঠী' গড়ে তোলেন। *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর সাথে জড়িত ছিলেন। *আজাদ*, ১৩ মে ১৯৫৮ ।

৯. *আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬ ।

১০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৬৮), ২২৮

১১. জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০), ১২০ ।

১২. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), ১০৯ ।

১৩. *ইত্তেফাক*, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ ।

১৪. সাঈদ-উর-রহমান, 'আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক,' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪, ১৮৪ ।

১৫. রেজোওয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), ৩৩৫ ।

১৬. *আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ ।

১৭. *আজাদ*, ৫ জুন ১৯৬২ ।

১৮. *আজাদ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ।

১৯. *আজাদ*, ২৮ নভেম্বর ১৯৬৩ ।

২০. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১৪৫ ।

২১. ইসরাইল খান, *বাংলা সাময়িকপত্র : পাকিস্তান পর্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪), ২৭ ।

২২. *প্রাগুক্ত*, ৬৮১ ।

২৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *সংগ্রাম* ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

২৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৩৬৯; ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, ২৮।

২৫. *পয়গাম*, ৬ জুলাই ১৯৬৮।

২৬. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, ১৬২।

২৭. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, ১৬৪।

২৮. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ থেকে ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩), ২২৮।

২৯. *আজাদ*, ১৫ এপ্রিল ১৯৬১।

৩০. *আজাদ*, ২৬ এপ্রিল ১৯৬১।

৩১. *প্রাগুক্ত*।

৩২. *আজাদ*, ১২ মে ১৯৬১।

৩৩. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), ৪২।

৩৪. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ১৯৮১), ১৪৭।

৩৫. গোলাম মুর্শিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), ২২৯-২৩০।

৩৬. *প্রাগুক্ত*, ২২৮।

৩৭. *সংবাদ*, ৭ মে ১৯৬১।

৩৮. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১৬৬।

৩৯. *ইত্তেফাক*, ২৩ এপ্রিল ১৯৬১।

৪০. *প্রাগুক্ত*, ২৩ এপ্রিল ১৯৬১।

৪১. *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৬১।

৪২. *প্রাগুক্ত*, ১২-১৬ মে ১৯৬১।

৪৩. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১৫৭।

৪৪. *আজাদ*, ৮ মে ১৯৬১।

৪৫. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক ধারা* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩), ৩৬৪।

৪৬. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩), ৩৫৪।

৪৭. *ইত্তেফাক*, ৯ মে ১৯৬৬।

৪৮. *আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৬১।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, ১৪ জুন ১৯৬৬।

৫০. *আজাদ*, ২০ মার্চ ১৯৬৭।

৫১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২৮৯; আবদুল হালিম, ‘বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-১৯৬৯’, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩), ১৫৩।

৫২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২৮৯; মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১৮১।

৫৩. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৩ জুন ১৯৬৭।

৫৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৩ জুন ১৯৬৭।

৫৫. বিবৃতিটি *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে শহীদল্লাহ কায়সারের নামও যুক্ত করা হয়। বিস্তারিত - হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২৮৮।

৫৬. বিস্তারিত - *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭।

৫৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭; বিস্তারিত - মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশ* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪), ২৯২-২৯৩।

৫৮. *আজাদ*, ২৬ মে ১৯৬৭।

৫৯. *প্রাগুক্ত*, ২৬ মে ১৯৬৭।

৬০. *আজাদ*, ৩০ জুন ১৯৬৭।

৬১. *আজাদ*, ১ জুলাই ১৯৬৭।

৬২. *পয়গাম*, ১ জুলাই ১৯৬৭।

৬৩. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২ জুলাই ১৯৬৭।

৬৪. *মর্নিং নিউজ*, ২৮ জুন ১৯৬৭।

৬৫. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১৮১।

৬৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ আগস্ট ১৯৬৭।

৬৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ আগস্ট ১৯৬৭।

৬৮. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, ২২০।

৬৯. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১১২।

৭০. *সংবাদ*, ২ জুলাই ১৯৬৭।

৭১. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ১৬৭-১৬৮।

৭২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৩৭২-৭৪; সাঈদ-উর-রহমান, *প্রাগুক্ত*, ১০৮।

৭৩. *আজাদ*, ২৭ আগস্ট ১৯৬৮।